প্রথম বর্ষ সংখ্যা - ৩
আষাঢ়-শ্রাবণ
১৪০৪

বিকল্প

(ন্যাশন্যাল অ্যালাইয়্যান্স অব পিপলস্ মুভমেন্টস্, পশ্চিমবঙ্গ)

১/৩
বুলেটিন

এই সংখ্যায় আছে

★ স্বাধীনতার নয়া যুদ্ধ

★ নতুন পথের খোঁজে
ডঃ পূণ্যব্রত গুণ

★ বহুজাতিক সংস্থার সাত সতের
শুভেন্দু দাশগুপ্ত

★ সংস্কৃতির সংকট ও রিসর্ট
আব্দুর রব

★ বিকল্প কৃষক আন্দোলনের
পথ সন্ধানে
অজিত নারায়ণ বসু

★ বিচিত্র সংবাদ

স্বাধীনতার নয়া যুদ্ধ

১৯৪৭ সালে ভারতে ব্রিটিশ কর্তৃক প্রত্যক্ষ শাসনের অবসান হয়। এই অর্থে বর্তমান বছর হ'ল ভারতের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর। একটি জাতির জীবনে পঞ্চাশ বছর নিতান্ত কম সময় নয়। দুনিয়ার মানচিত্রে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে এই পঞ্চাশ বছরে। ভারতের মতন একই অর্থে পরাধীন বহু দেশ এই সময়ে স্বাধীন হয়েছে। এই সদ্য স্বাধীন অনেক দেশ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত অনেক দেশ, আপন উদ্যম ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের পুনর্গঠিত করেছে ; প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আপন মর্যাদায় ও স্বনির্ভরতায়। যদিও এই সকল দেশে দেশে সর্বত্র যে বৈষম্য ও বঞ্চনা তিরোহিত হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। কিছু দেশে যেখানে সামাজিক ন্যায় ও সমতা কিয়ৎ পরিমাণ অর্জিত হয়েছিল সেগুলির মধ্যে কোথাও কোথাও কিছু বিপর্যয় নেমে এসেছে। কিন্তু সাধারণভাবে দেশে দেশে শ্রমজীবী মানুষ অর্থাৎ শ্রমিক, কৃষক ও সর্বস্তরের অন্যান্য সাধারণ মানুষ যাদের প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ শ্রমে সৃষ্টি হয় সম্পদ, তাদের সামাজিক ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠার লড়াই এই পঞ্চাশ বছরে এগিয়েছে কদম কদম। আপন ভাগ্যকে জয় করে নেবার লড়াইয়ে নিজেদের করেছে ঐক্যবদ্ধ।

স্বাধীনতার এই পঞ্চাশ বছরে ভারতকেও আমাদের চিনে নিতে হবে এই আলোকে পঞ্চাশ বছরে সে কতটা পুনর্গঠিত হয়েছে, কতটা আত্মমর্যাদা ও স্বনির্ভরতায় প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে ; দেশের প্রায় একশত কোটি মানুষের কত অংশ আজ বৈষম্য, বঞ্চনা ও শোষণ মুক্ত। কেননা সংশয় ছিল শুরু থেকেই। কারুর কাছে সে দিনের স্বাধীনতা ছিল আধা, কারুর কাছে খণ্ডিত ; কারুর মূল্যায়ণে দেশ জড়িয়ে পড়েছিল নয়া ঔপনিবেশিকতার জালে। আবার কারুর বিশ্লেষণে দেশ পুরানো উপনিবেশের জায়গায় হয়ে উঠল আধা-ঔপনিবেশিক — আধা সামন্ততান্ত্রিক। কারুর মূল্যায়ণ হ'ল ভারত রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেল ; অর্থনৈতিক পরাধীনতা রয়ে গেল।

এই সংশয় ও এই সকল প্রশ্নের উত্তর খোঁজার একটাই আলোকবর্তিকা। তা হ'ল এ দেশের অগণিত মানুষের নিকট মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার শর্তাবলী স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে কতটা উন্মুক্ত হয়েছে। স্বাধীনতার অর্থ তো প্রতিটি মানুষের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-স্বাস্থ্য-শিক্ষা পাবার এবং অবাধ মানবিক চর্চার অধিকার! যা কোন কিছুর দ্বারা খণ্ডিত নয়, নিয়ন্ত্রিত নয়। স্বাধীনতার অর্থ তো শোষিত না হবার অধিকার, স্বাধীনতার অর্থ বঞ্চিত না হবার অধিকার ; স্বাধীনতার অর্থ মুক্ত চিন্তার অধিকার। স্বাধীনতার অর্থ জাতি-ধর্ম-বর্ণ ভেদে নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত না হবার অধিকার। স্বাধীনতার অর্থ পুলিশ-মিলিটারী আর শাসকদের অত্যাচারে অত্যাচারিত না হবার অধিকার। স্বাধীনতার অর্থ আমলা-প্রশাসক-বিচারকদের দ্বারা প্রতারিত, ভীত-সন্ত্রস্ত না হবার অধিকার। স্বাধীনতার অর্থ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করার অধিকার এই দুনিয়ায় যা কিছু সম্পদ তা প্রকৃতির দান আর মানুষের শ্রমের সমন্বয়ে গঠিত ; মানুষের বিন্দু বিন্দু শ্রমে-ঘামে মানুষের বেঁচে থাকার প্রতিটি রসদ তৈরী ; এর উপর প্রতিটি উৎপাদক মানুষের সমান অধিকার। সমান অধিকার যা কিছু শ্রেয়, যা কিছু প্রেয়, যা কিছু মঙ্গলময় তাতে।

[এই সংখ্যায় নিয়মিত বিভাগ **'মতামত'**-এর পরিবর্তে আমরা চারটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলাম। "স্বাধীনতার পঞ্চাশ" বছরে ভারতের অর্থনীতি, শ্রমিক আন্দোলন, সংস্কৃতি ও গ্রামীণ বিকাশ বিষয়ে লেখকগণ তাঁদের চোখে ধরা পড়া বিশেষ বিশেষ দিকগুলি এই লেখাগুলিতে তুলে ধরেছেন। স্বাধীনতার স্বরূপ বুঝতে লেখাগুলি আমাদের সাহায্য করবে। **সম্পাদক, বিকল্প**]

নতুন পথের খোঁজে

ডঃ পুণ্যব্রত গুণ

"অর্থনীতিবাদের অন্ধকার নয়, আর্থিক সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির অবলোকন চাই, চাই আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা, চাই নতুন সংস্কৃতির বিশুদ্ধ বাতাস, চাই বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন।" — **শঙ্কর গুহনিয়োগী**

ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাস শতাধিক বর্ষের পুরনো। কিন্তু কি দক্ষিণপন্থী, কি বামপন্থী কোন রাজনৈতিক পার্টিই শ্রমিক আন্দোলনকে অর্থনীতিবাদের পাঁক থেকে মুক্ত করেননি। সেদিক থেকে ব্যতিক্রমী এক উল্লেখযোগ্য প্রয়াস শুরু হয় আজ থেকে ২০ বছর আগে ১৯৭৭-এ কমরেড শঙ্কর গুহনিয়োগীর নেতৃত্বে ছত্তিশগড়ের শ্রমিক আন্দোলনে। সে আন্দোলন আর্থিক দাবীর বড় বড় লড়াইয়ে একের পর এক জয় হাসিল করার পাশাপাশি শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থার লক্ষ্যে কদম কদম এগিয়ে চলে। মর্মবস্তুতে এবং প্রকৃতিগত দিক থেকে এ আন্দোলন ছিল অন্যান্য শ্রমিক আন্দোলন থেকে অনেকটাই ভিন্ন ধরনের।

১৯৭৭-এর ৩রা মার্চ 'ছত্তিশগড় মাইনস্ শ্রমিক সংঘ' গঠনের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু। এই বছরেরই ২-৩ জুন পুলিশের গুলিতে ১১ জনের শহীদত্ব বরণে তার অগ্নিদীক্ষা। আর ১৯৯১-এর ২৮শে সেপ্টেম্বর কমরেড নিয়োগী যখন শ্রেণী সংগ্রামে শহীদ হলেন, তখন ছত্তিশগড়ের সাতটি জেলার মধ্যে পাঁচটিতে ছড়িয়ে পড়েছে সেই নতুন ধারার সংগঠন। নিয়োগী হত্যায় অবদমিত না হয়ে আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে, ১৯৯২-এর ১লা জুলাই আবার আত্মবলিদান করেন ১৬ জন শ্রমিক। তারপর নিয়োগী-পরবর্তী নেতৃত্বের দুর্বলতায় ছত্তিশগড় শ্রমিক আন্দোলন আজ দুর্বল, পথচ্যুত বটে। কিন্তু নতুন পথে চলার এই প্রয়াস থেকে আজও শিক্ষা নিতে হবে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীকে।

কাজের শুরু অসংগঠিত খনি শ্রমিকদের মধ্যে ঃ

সাধারণ ধারণা হল — আধুনিক বৃহৎ শিল্পের শ্রমিকরা স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে থাকা এবং সেই শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কিন্তু কর্মজীবনের শুরুর সাত বছর ভিলাই ইস্পাত কারখানার দক্ষ শ্রমিক এবং ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক হিসাবে লব্ধ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে নিয়োগী দেখেছিলেন যে আধুনিক প্রযুক্তির বড় শিল্পগুলিতে দক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে অর্থনীতিবাদ ক্রমেই প্রাধান্য বিস্তার করছে। জঙ্গী অর্থনীতিবাদী আন্দোলন তাঁদের মধ্যে সুবিধাবাদ ও সংগ্রাম-বিমুখতার জন্ম দিচ্ছে। সেদিক থেকে অসংগঠিত অদক্ষ ঠিকা শ্রমিকদের মধ্যে সংগ্রামী সম্ভাবনা অনেক বেশী। সমাজের নীচুতলার এই মানুষরা ভবিষ্যৎ সংগ্রামের বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন।

নিয়োগীর এই ভাবনা অনুযায়ী কাজ বেশ কিছুদূর অবধি সফল হয়। দল্লী রাজহরার পিছিয়ে থাকা খনিশ্রমিকদের মধ্যে যে সংগঠনের শুরু, তা ছড়িয়ে পরে ছত্তিশগড়ের অন্যান্য খনি অঞ্চলে, খনি-শ্রমিকরা শ্রেণী সংগ্রামের প্রথম সারিতে এসে দাঁড়াল। ভিলাই, টেড়েসরা, উরলা, কুম্হারী, বালোদা বাজার প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলের অস্থায়ী ঠিকা শ্রমিকরা সংগ্রামের ময়দানে অবতীর্ণ হন। তাঁদের আন্দোলনের ধাক্কায় দুলে ওঠেন ইস্পাতশিল্প, বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকদেরও একটি অংশ।

অর্থনীতিবাদের বিরুদ্ধে ঃ তাঁর একটি বহুল প্রচারিত প্রবন্ধে নিয়োগী লেখেন "আর্থিক দাবীতে সংগ্রাম করলেই অর্থনীতিবাদ হয় না। কিন্তু যখন আর্থিক দাবীর সংগ্রাম হয় এবং বাকী সমস্ত রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রশ্নকে শিকেয় তুলে রাখা হয় তখন সেই ধরণের নীতিকেই অর্থনীতিবাদ বলে।"

এ যাবৎ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ছিল শ্রমিকদের জীবনের আট ঘণ্টার জন্য, যে আট ঘণ্টা শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে কাটান। বেতন, বোনাস, ছুটি আর চার্জশিটের জবাব লেখা মাত্র ছিল ইউনিয়নের কাজ। বাকী ষোলো ঘণ্টা শ্রমিক কিভাবে কাটাবেন তা নিয়ে ইউনিয়ন মাথা ঘামাত না।

নিয়োগী শ্লোগান দেন — "ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শ্রমিকদের জীবনের আট ঘণ্টার জন্য শুধু নয় — চব্বিশ ঘণ্টার জন্য।"

কেবল শ্লোগান নয়, শুরু হয় শ্লোগানকে বাস্তবে প্রয়োগের প্রয়াস।

শ্রমিকরা বস্তিতে থাকেন। বস্তির উন্নয়নের দাবীতে আন্দোলন চালানোর জন্য গড়ে ওঠে **'বস্তি সুধার বিভাগ'**।

মানুষের মৌলিক প্রয়োজনগুলির মধ্যে অন্যতম, শিক্ষা। কেন না শিক্ষা আনে চেতনা। ইউনিয়নের **'শিক্ষাবিভাগ'**-এর উদ্যোগে ছয়টি প্রাথমিক স্কুল গড়ে তুলে শ্রমিক-সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ তৈরী করা হয়। আন্দোলন করে প্রশাসনকে বাধ্য করা হয় পর্যাপ্ত সংখ্যায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুল এবং কলেজ স্থাপনে।

নিরক্ষর শ্রমিকদের জন্য **স্বাক্ষরতার কর্মসূচী** নেওয়া হয়। শ্রমিকদের শিক্ষার জন্য গড়ে ওঠে ইউনিয়নের **লাইব্রেরী বিভাগ**। রাজনৈতিক শিক্ষার জন্য চালানো হতে থাকে **পাঠচক্র**।

মানবজীবনের আরেকটি অত্যাবশ্যক বিষয় স্বাস্থ্য। ইউনিয়নের **স্বাস্থ্য বিভাগ** শুরু করে "স্বাস্থ্যকে লিয়ে সংঘর্ষ করো" (স্বাস্থ্যের জন্য সংগ্রাম করো) আন্দোলন। গড়ে তোলা হয় শহীদ হাসপাতাল যা একাধারে সুলভে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটি মডেল, জনশিক্ষার একটি মাধ্যম এবং জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের এক হাতিয়ার। শহীদ হাসপাতাল চিকিৎসার কাজের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য নিরন্তর প্রয়াস চালায়। আরেকটি উল্লেখনীয় অভিনবত্ব ছিল শহীদ হাসপাতালের পরিচালনায় — চিকিৎসক, কর্মী, রোগী, শ্রমিক প্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধিদের সম

অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই কর্মসূচীর পরিচালনা শোষণহীন নতুন সমাজে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কেমন হতে পারে তার ছবি তুলে ধরত।

ছত্তিশগড়ের নতুন ধারার শ্রমিক আন্দোলন অভিনব ছিল তার **মদ্যপান বিরোধী আন্দোলনের** মধ্যেও। প্রথাগত বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলি নেশাবিরোধী কর্মসূচীকে কখনও নিজেদের আন্দোলনের বিষয় বলে মনে করেনি। অন্যদিকে গান্ধীবাদীরা বহু দশক ধরে নেশাবিরোধী আন্দোলন চালিয়েও উল্লেখ করার মত সফলতা লাভ করতে পারেননি, কেননা শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে নেশাবিরোধী আন্দোলনের সম্পর্ক স্থাপনে তাঁদের প্রয়াস ছিল না।

ছত্তিশগড়ের আদিবাসীদের কাছে মদ্যপান কোন সামাজিক অপরাধ ছিল না। তাই ৭৭-এর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে শ্রমিকদের মজুরীতে ৪-৫ গুণ বৃদ্ধি শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানে প্রতিফলিত না হয়ে স্থানীয় মদের ভাঁটির বিক্রি বৃদ্ধিতে প্রতিফলিত হল। নিয়োগী শ্রমিক শহীদের রক্ত মদের ভাঁটির নালায় বওয়াতে দিতে রাজী ছিলেন না। নিয়োগী শ্রমিকদের বোঝান যে (১) মদের নেশায় আয়ের এক বড় অংশ নষ্ট হয় ; তাই আন্দোলনের ফলে বেতন বৃদ্ধি হলেও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হয় না, (২) মদের ব্যবসায়ীরা শোষক শ্রেণীভুক্ত, মদ তাদের শোষণের হাতিয়ার (৩) মদ স্বাস্থ্যের পক্ষে যেমন ক্ষতিকর তেমনি ক্ষতিকর মনের জন্য, মদ সংগ্রামী মানুষের সংগ্রাম স্পৃহাকে দুর্বল করে দেয়। প্রায় ৯৫% শ্রমিক মদের নেশা ছেড়ে দেন।

কিন্তু মদ ছিল শ্রমিকদের অবসর সময় কাটানোর মাধ্যম। মদ ছাড়ার পর শ্রমিকরা অবসর সময় কাটাবেন কিভাবে? ইউনিয়নের **সাংস্কৃতিক বিভাগ** 'নয়া অজ্ঞোর' (নতুন আলো) সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে কবিতা-গান-নাটকের মাধ্যমে নয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রচার করতে লাগল। শ্রমিকরা যাতে সময় কাটাতে সিনেমা হলে অবক্ষয়ী ফিল্ম দেখতে ভিড় না জমান, তাই ধীরে ধীরে ইউনিয়ন কিনল স্লাইড প্রোজেক্টর, ১৬ মিমি ফিল্ম প্রোজেক্টর, টিভি, ভি. সি. আর। ধীরে ধীরে গড়ে তোলা হল সুস্থ ও প্রগতিশীল ভিডিও ক্যাসেটের লাইব্রেরী। শ্রমিকদের কবি-প্রতিভা, গায়কী-প্রতিভাকে উৎসাহিত করা হল। বেশ কিছু শ্রমিক গায়ক-কবি আন্দোলনের প্রচার-প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন।

যাঁরা খেলাধূলায় আগ্রহী তাঁদের জন্য ইউনিয়নের **ক্রীড়া বিভাগ** গড়ে দুটি ক্লাব 'শহীদ সুদামা অ্যাথলেটিক ক্লাব' এবং 'রেডগ্রীন ক্লাব'। ব্যায়াম, ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, কবাডিতে পারদর্শী হয়ে ওঠেন অনেক শ্রমিক।

নারী অর্ধেক আকাশ ঃ নারীর শোষণ মুক্তি না হলে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি হতে পারে না। অথচ নারী মুক্তির প্রশ্ন শ্রমিক ইউনিয়নগুলিতে বা শ্রমিকশ্রেণীর তথাকথিত পতাকাবাহী রাজনৈতিক পার্টিগুলিতে গুরুত্ব পায় না।

আলোচ্য নতুন ধারার শ্রমিক আন্দোলনে কিন্তু এর প্রয়াসে গড়ে উঠল 'মহিলা মুক্তি মোর্চা' যার লক্ষ্য— (১) নারী নেতৃত্বের বিকাশ, (২) নারীদের উপর সামন্তবাদী শোষণের বিরোধিতা, (৩) সমাজের অন্যান্য শোষিতবর্গের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন, (৪) পুঁজিবাদী শোষণের বিরোধিতা, (৫) শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে নয়া মূল্যবোধের প্রসারের জন্য লড়াই করা।

শ্রেণী মৈত্রী ও জাতীয়তার প্রশ্ন ঃ নিয়োগী বলেছিলেন — "অবিকশিত দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন যদি দেশের সমস্ত দেশপ্রেমিক শক্তির মোর্চা বানিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দিশায় না এগোয়, তাহলে অর্থনীতিবাদের পাঁকে পড়ে এক বিকৃত রূপ ধারণ করা ছাড়া তার সামনে অন্য কোন রাস্তা থাকে না।" তাঁর ভাবনা ছিল — "আঞ্চলিক বিকাশে আঞ্চলিক জনতার অংশগ্রহণই জাতীয় বিকাশের গ্যারান্টি। আঞ্চলিক বিকাশে বাইরে থেকে আসা শ্রমিকরা আগ্রহ দেখান না, কেননা তাঁদের জাতীয়, সাংস্কৃতিক ও আর্থিক পশ্চাৎভূমি পৃথক। এইভাবে শিল্পের অধিকাংশ শ্রমিক (অঞ্চলের) বাইরে থেকে আসার ফলে তাঁরা আঞ্চলিক বিকাশে মূল ধারা থেকে সরে যান, নেতৃত্ব দেওয়া তো দূরের কথা।"

বর্তমানশোষণহীন সমাজ ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে শোষণহীন গণতান্ত্রিক সমাজ স্থাপনের জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে তার বন্ধুশ্রেণীগুলির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে হয়। আর জাতিসত্ত্বার মুক্তি তথা জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ছাড়া গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে ওঠে না।

শ্রেণী মৈত্রীর ধারণা প্রচারের প্রথম পদক্ষেপ ছিল — নতুন ধারার আন্দোলন — সংগঠনের পতাকা — পতাকার লাল রং শ্রমিক শ্রেণীর আত্মদানের প্রতীক, সবুজ শ্রমিক শ্রেণীর দৃঢ় মিত্র কৃষক সমাজের দ্যোতক।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে প্রারম্ভিক সাফল্যের পরপরই গড়ে ওঠে ইউনিয়নের **কিষান বিভাগ**। শ্রমিক নেতৃত্বে কৃষকদের নানা সমস্যা সমাধানে সংগ্রাম গড়ে ওঠে।

আত্মবিস্মৃত জাতি মুক্তিআন্দোলনে অগ্রসর হতে পারে না। নিয়োগী ইতিহাসের অন্ধকার থেকে তুলে আনলেন ১৯৫৭-র ছত্তিশগড়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদবিরোধী কৃষক আন্দোলনের নেতা নারায়ণ সিংহের সংগ্রামের কাহিনী। শহীদ বীর নারায়ণ সিংহ শ্রমিক-কৃষকের মুক্তি আকাঙ্ক্ষার অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠেন।

শ্রমিক আন্দোলনের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে **কিষান বিভাগ** রূপ নেয় **ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চায়।**

"ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চা ছত্তিশগড়ের শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক শ্রেণীগুলির সংগ্রামী মোর্চা। শিল্পশ্রমিকশ্রেণী এই মোর্চার অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী শক্তি। ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চা সংগঠনটিকে ছত্তিশগড়ের শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুব, নারী এবং অন্যান্য শ্রেণী স্বেচ্ছায় গড়ে তোলেন গুণগতভাবে ছত্তিশগড়ের মানুষের আর্থিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের লক্ষ্যে, ছত্তিশগড়ের ভৌগোলিক অঞ্চলে এক স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলে ছত্তিশগড়ী মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগানো এবং এক শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়ার লক্ষ্যে।"

কেবল সংগঠনের ইস্তাহারে উপরোক্ত বিষয় দুটির উল্লেখ নয়, বাস্তব রূপ দেখা যেত আন্দোলনগুলিতেও। নিয়োগী শ্রমপুত্র (শ্রমিক, যাঁদের অধিকাংশ জন্মগতভাবে ছত্তিশগড়ের নন) এবং ভূমিপুত্র

(ছত্তিশগড়ের কৃষক সমাজ) এর ধারণা আনেন। নিয়োগী বারবার গ্রীক পুরাণের বীর এন্টিউসের উদাহরণ দিতেন, যতক্ষণ তাঁর পা মাটিতে তিনি অজেয়। নিয়োগী বোঝাতেন — তেমনি যদি শ্রমপুত্র ভূমিপুত্রের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক রাখেন তা হলেই তাঁরা জয়ী হতে পারেন। ছত্তিশগড়ের অধিকাংশ আন্দোলন যে জয়যুক্ত হতে পেরেছিল তার কারণ সাধারণ মেহনতী মানুষও এই সাধারণ সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

সংঘর্ষ ও নির্মাণের রাজনীতি ঃ "সংঘর্ষ কে লিয়ে নির্মাণ, নির্মাণ কে লিয়ে সংঘর্ষ" অর্থাৎ সংগ্রামের জন্য নির্মাণ, নির্মাণের জন্য সংগ্রাম — এই রাজনীতির মূল কথা। শোষণহীন সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে সংগ্রামগুলিকে চালনা করতে হবে, সেই সংগ্রাম চালানোর সময় শ্রমিকশ্রেণী নিজের উদ্যোগ, নিজের শক্তিতে কিছু কিছু নির্মাণ কাজ (বিপ্লবী সংস্কারের কাজ) করবে। এইসব নির্মাণের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠবে ভবিষ্যত সমাজের স্বপ্নের এক একটি অংশের রূপরেখা — শ্রমিকশ্রেণী আত্মবিশ্বাসী হবে, জনমুখী এইসব বিকল্প পরিবর্তনের লড়াইতে অনুপ্রাণিত করবে ব্যাপক জনতাকে। মানুষ যেমন চলে দুটি পায়ে, তেমনি ছত্তিশগড়ে শ্রমিক আন্দোলন চলেছিল সংঘর্ষ ও নির্মাণরূপী দুই পায়ে।

ছত্তিশগড় শ্রমিক আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য আরও কিছু দিক

ক) ছত্তিশগড়ের শ্রমিক আন্দোলনে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে শ্রমিকশ্রেণী ব্যবহার করতেন সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনের পাঠশালা এবং হাতিয়ার হিসাবে।

খ) ট্রেড ইউনিয়নের সিদ্ধান্ত সমাজের সবথেকে প্রতিক্রিয়াশীল ও ঘৃণিত শক্তিকে নিজের শত্রু ঘোষণা করে বাকী শ্রেণীগুলির সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের প্রয়াস নিত, প্রতিক্রিয়াশীলদের নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব বাড়াতে সাহায্য করত এবং এক নমনীয় কার্যপদ্ধতির উপর নির্ভর করে প্রতিটি বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণের চেষ্টা করত।

গ) ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালনা করা হত গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিতে। আন্দোলন সম্পর্কিত সকল সিদ্ধান্ত, সংগঠন সংক্রান্ত সকল প্রশ্নের মীমাংসা করা হত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এবং কেন্দ্রিকতার মাধ্যমে সেইসব সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হত।

ঘ) খুব গুরুত্ব পেত নেতৃত্বের প্রশ্ন। অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন-এর মত মধ্যশ্রেণীর ব্যক্তিরা শ্রমিক নেতা হতে পারতেন না। নেতৃত্বকে হতে হত নিজের শ্রেণীর সবচেয়ে শ্রেণী সচেতন অংশ। সবচেয়ে শ্রেণী সচেতন হওয়ার জন্য যে চারসূত্রের নিয়ম অবলম্বন করা হত তা হল — শ্রেণীসংগ্রামে সাহসিকতার সঙ্গে অংশগ্রহণ, উৎপাদন সংগ্রামে অংশগ্রহণ, ইতিহাসের অধ্যয়ন ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ।

সংক্ষেপে বলতে গেলে এভাবেই ছত্তিশগড়ের মাটিতে নতুন ধারার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের খোঁজে নিরন্তর পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছিল ১৯৭৭ থেকে '৯১ অবধি। এ পরীক্ষা যে সর্বাংশে অভ্রান্ত ছিল না, তা বোঝা যায় কমরেড নিয়োগীর মৃত্যুর পর ছত্তিশগড় শ্রমিক আন্দোলনের ক্রমশঃ শক্তি ক্ষয় থেকে। তবুও যাঁরা নতুন ধারায় শ্রমিক আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে চান, তাঁদের ছত্তিশগড় শ্রমিক আন্দোলনের ইতিবাচক দিকগুলি থেকে শিক্ষা নিয়েই এগোতে হবে।

বহুজাতিক সংস্থার সাত-সতের *

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

বহুজাতিক সংস্থার সংজ্ঞার্থ

১। এমন একটা সংস্থা যে বিভিন্ন ধরনের আর্থনীতিক কাজে নিযুক্ত

২। মূল সংস্থাটা সংস্থার নিজের দেশে স্থাপিত। নিজের দেশ বলতে প্রদানতঃ পশ্চিম ইওরোপ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জাপান

৩। বহুদেশে শাখা সহযোগী সংস্থা বিস্তৃত

৪। বিশাল আর্থিক ও প্রযুক্তি ক্ষমতা

৫। এক একটি শিল্পে একচেটিয়া আধিপত্য

৬। ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আঞ্চলিক অথবা বিশ্ব বিকল্পের প্রেক্ষিতে

একটি সংস্থার বহুজাতিক সংস্থা হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া

১। একটি সংস্থার বহুজাতিক হয়ে ওঠার পূর্বশর্ত তার নিজের দেশে কোন কোন শিল্পে একচেটিয়া হয়ে ওঠা।

একটি সংস্থার একচেটিয়া হয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন পুঁজি ও প্রযুক্তি ক্ষমতা।

২। পুঁজির ক্ষমতা বলতে বোঝায় বিরাট পরিমাণ পুঁজি সংগ্রহের সামর্থ এবং বিশাল পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারা এবং করা। এই বিশাল পুঁজি বিনিয়োগ থেকেই তৈরী হয় সেই শিল্পের উৎপাদনে সংস্থার নেতৃত্ব। এই নেতৃত্ব থেকেই জন্ম নেয় উৎপাদনে একচেটিয়াকরণ। আধিপত্য।

৩। প্রযুক্তির ক্ষমতা বলতে বোঝায় কোন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করার সামর্থ। উদ্ভাবিত প্রযুক্তিকে উৎপাদনে প্রথম প্রয়োগ করা। উৎপাদিত পণ্য প্রথম বাজারে নিয়ে আসা। উৎপাদনে প্রথম প্রযুক্তি প্রয়োগ করা থেকে তৈরী হয় সেই সংস্থার প্রযুক্তি নেতৃত্ব। এই নেতৃত্ব থেকেই জন্ম নেয় প্রযুক্তিতে আধিপত্য।

৪। উৎপাদনে আধিপত্য ও প্রযুক্তিতে আধিপত্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। প্রযুক্তির আধিপত্য থেকে তৈরী হয় উৎপাদনে আধিপত্য। উৎপাদনে আধিপত্য থেকে আসে মুনাফা। মুনাফা থেকে বাড়তি পুঁজি। সেই পুঁজি বিনিয়োগ করা হয় নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে। নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবনে প্রযুক্তির আধিপত্য জোরদার হয়। এ এক অবিরত প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে উৎপাদন পুঁজি নির্ভর আর প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে ওঠে। এই নির্ভরতা ক্রমাগত বেড়ে চলে। যত এই নির্ভরতা বাড়ে আধিপত্য তত বেড়ে চলে।

৫। একটা সংস্থাকে শুধু আধিপত্য তৈরী করলেই চলে না, তাকে টিঁকিয়ে রাখতে হয়।

আধিপত্য থেকে তৈরী হয় উৎপাদনে অভিজ্ঞতা, উৎপাদনে সুবিধা এবং উৎপাদন ব্যবস্থার বিরাট আকার। উৎপাদনে সুবিধা বলতে বোঝায় একটা সংস্থার যত বেশি পরিমাণ উৎপাদন হবে, উৎপাদিত পণ্যের প্রতি একক পিছু উৎপাদন খরচ কমে যাবে. মুনাফা বাড়বে। উৎপাদন ব্যবস্থার বিরাট আকার বলতে বোঝায় একটা ব্যবস্থার মধ্যে বিশাল পরিমাণ উৎপাদন করানো। ফলে পণ্যের একক পিছু উৎপাদন ব্যয় কম হয়, মুনাফা বেশি হয়।